ফেব্রুয়ারি, ২০১৮

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

উপ-অধিকর্তা : **খুরশিদ এ. মালিক**

সম্পাদক : **রমা মন্ডল**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

প্রচ্ছদ : **গজানন পি. ধোপে**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯
ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬
ই-মেল : bengaliyojana@gmail.com

গ্রাহক মূল্য : ২৩০ টাকা (এক বছরে)
৪৩০ টাকা (দু-বছরে)
৬১০ টাকা (তিন বছরে)
ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in
ফেসবুক : www.facebook.com/KolkataPublicationsDivision

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় — ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে — ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- সুশাসনের সারকথা অভিযোগ সুরাহারায় সার্থক ব্যবস্থা — কে. ভি. ইপেন — ৫
- জন অভিযোগের প্রতিবিধান : প্রশাসনের অন্যতম চ্যালেঞ্জ — ডলি অরোরা — ৮
- প্রশাসনের তিন ইষ্টমন্ত্র : জবাবদিহি, দায়িত্ব, স্বচ্ছতা — উদয় এস. মেটা, সিদ্ধার্থ নারায়ণ — ১২
- নাগরিক সনদ নিয়ে আর গড়িমসি নয় — মীনা নায়ার — ১৫
- জন অভিযোগ সুরাহায় তথ্যের অধিকার আইন অন্যতম হাতিয়ার — দেবজ্যোতি চন্দ — ১৮
- স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ক্ষোভ-অভিযোগ মেটানো জরুরি — ড. সঞ্জীব কুমার — ২০

বিশেষ নিবন্ধ

- বৈদ্যুতিন-প্রশাসন মারফত জন অভিযোগ সুরাহা — ড. যোগেশ সুরি, দেশগৌরব সেখরি — ২৫

ফোকাস

- অভিযোগ নিষ্পত্তি : মেয়েদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ — ভি. আমুথাভাল্লি — ২৮

অন্যান্য নিবন্ধ

- স্বচ্ছ ভারত : অভ্যাস বদলে জনসংযোগই চাবিকাঠি — পরমেশ্বরণ আইয়ার — ৩১
- স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অর্থসংস্থান : নতুন প্রস্তাবনা — কবিতা সিং — ৩৫
- বস্ত্র শিল্পে পণ্য ও পরিষেবা করের প্রভাব — সি. চিন্নাপা — ৩৮
- আধুনিক কৃষির ক্ষতিকর প্রভাবে পরিবেশের দূষণ — ড. সিতাংশু সরকার — ৪২

নিয়মিত বিভাগ

- জানেন কি? — যোজনা ব্যুরো — ৪৮
- যোজনা ক্যুইজ — সংকলন : রমা মণ্ডল, পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী — ৪৯
- যোজনা নোটবুক — —ওই— — ৫০
- যোজনা ডায়েরি — —ওই— — ৫২
- যোজনা কলাম — সংকলন : যোজনা ব্যুরো — ৬৪
- উন্নয়নের রূপরেখা — —ওই— — ৬৬

আধুনিক কৃষির ক্ষতিকর প্রভাবে পরিবেশের দূষণ

ড. সিতাংশু সরকার

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের, এমনকি অনেক বড়ো চাষিদেরও কৃষি-বিষের দূষণ বা ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বছরের পর বছর সুপারিশ মাত্রার থেকে বহুগুণ বেশি হারে কৃষি-বিষ প্রয়োগের ফলে, রোগ-পোকার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রযুক্ত কৃষি-বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে এবং দিন দিন যথেচ্ছ বেশি পরিমাণে কৃষি-বিষ প্রয়োগ করেও তার নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

ভারতের শতকরা ৬৫ শতাংশ বা তারও কিছু বেশি মানুষ সরাসরি কৃষির সঙ্গে যুক্ত, তাই ভারত প্রধানত কৃষিনির্ভর দেশ। আরও একটি তথ্য এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে জানা দরকার যে, ১৯৬০ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৪৫ কোটি, যা ২০১৫ সালে বেড়ে প্রায় ১৩১ কোটি হয়েছে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ভারতের মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ছিল মাত্র ৫ কোটি ৮ লক্ষ টন, যা বর্তমানে ২৬ কোটি টন ছাড়িয়ে গেছে। গত শতকের ষাটের দশকের তুলনায়, ২০১৫ সালে দানাশস্যের উৎপাদন ৩.৪ গুণ, তৈলবীজের উৎপাদন ৩.৯ গুণ, তন্তু ফসলের উৎপাদন ৩.৩ গুণ, সবজির উৎপাদন ৬.৯ গুণ এবং ফলের উৎপাদন ৬.৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উত্তরোত্তর বেড়ে চলা জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে যাতে কোনওভাবেই খাদ্য আমদানি করতে না হয়, সেই কারণেই এই পরিমাণ উৎপাদন আবশ্যিক। ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে ভারত পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম দেশ, কিন্তু জনসংখ্যার ভিত্তিতে দ্বিতীয় স্থানে আছে (চিনের পরে)। স্বাধীনতার সময় থেকে বর্তমানে জনসংখ্যা সাড়ে তিনগুণ বেড়েছে, সেই সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনে বৃদ্ধি হয়েছে ৫ গুণেরও বেশি। সেই কারণে মাথাপিছু খাদ্যশস্যের জোগানও বেড়েছে। ১৯৫১ সালে বছরে জনপ্রতি খাদ্যের জোগান ছিল ১৪৪ কিলোগ্রাম, তা বেড়ে বর্তমানে হয়েছে ১৮৬ কিলোগ্রাম/প্রতি বছরে। ভারত বর্তমানে খাদ্যশস্যে শুধু স্বনির্ভরই নয়, বরং যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানিও করছে। গত অর্থ বছরে, ভারত ২০ হাজার কোটি টাকার বাসমতী চাল, ১৫ হাজার কোটি টাকার অন্য চাল, ১১ হাজার কোটি টাকার গম, ১৬ হাজার কোটি টাকার মশলাপাতি রপ্তানি করেছে। এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদনের অনুকূল কৃষি-প্রযুক্তিগুলি হল : উন্নত ও অধিক ফলনশীল বীজ, হাইব্রিড বা সংকর জাত, রাসায়নিক সার, রাসায়নিক কীট ও মাকড় নাশক, ছত্রাকনাশক, আগাছানাশক, ফলন বৃদ্ধিকারী বিভিন্ন প্রকারের হরমোন, সেচ ব্যবস্থা (প্রধানত ভূগর্ভস্থ জল), নিবিড় শস্য পর্যায়ের ব্যবহার ইত্যাদি।

কৃষি-রাসায়নিক ব্যবহার ব্যতিরেকে শুধুমাত্র উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার বা সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে এত পরিমাণে কৃষিপণ্যের উৎপাদন সম্ভব হয় না। কেননা, তথ্যানুযায়ী ভারতে খাদ্যশস্যের ফলন, আগাছার প্রকোপে শতকরা ৩৩ শতাংশ, রোগের জন্য ২৬ শতাংশ, কীটশত্রুর জন্য ২০ শতাংশ, খাদ্যশস্যের গোলার পোকার দ্বারা ৭ শতাংশ ও ইঁদুরের উৎপাতে ৬ শতাংশ নষ্ট হয়। তাই বেশিমাত্রায় শস্যের উৎপাদনের জন্য এই কৃষি-রাসায়নিকের ভূমিকার কথা স্বীকার করতেই হয়।

সমস্যা

কৃষি-বিষের আলোচনার শুরুতে জেনে নেওয়া যেতে পারে যে, বিষাক্ততার মাত্রা হিসাবে কৃষি-বিষের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি কৃষি-বিষের মোড়কের উপর

[লেখক প্রধান বিজ্ঞানী (শস্যবিজ্ঞান), ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ—কেন্দ্রীয় পাট ও সহযোগী তন্তু অনুসন্ধান সংস্থা। ই-মেল : sitangshu.sarkar@icar.gov.in]

ত্রিভূজাকৃতি বিশেষ চিহ্ন দেওয়া থাকে। লাল রংয়ের ত্রিভূজের অর্থ 'খুবই বিষাক্ত', হলুদ রংয়ের ত্রিভূজে 'যথেষ্ট বিষাক্ত', নীল ত্রিভূজে 'মাঝারি বিষাক্ত' ও সবুজ ত্রিভূজে 'কম বিষাক্ত' বোঝায়। কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশকের উদ্ভাবন কাল হিসাবেও এই কৃষি-বিষগুলির শ্রেণিবিভাগ আছে। সাম্প্রতিক সময়ে উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত কৃষি-বিষগুলি প্রকৃতির জন্য কম ক্ষতিকর। ১৯৪০ সালের আগে বিভিন্ন অজৈব যৌগ কীটনাশক হিসাবে বহুল প্রচলিত ছিল। যেমন, আর্সেনিক, পারদ (মার্কারি), সিসার বিভিন্ন যৌগ। এগুলিকে প্রথম পর্যায়ের কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত, প্রকৃতিতে এর বিরূপ প্রভাব ছিল খুবই বেশি। দ্বিতীয় পর্যায়ে, ১৯৪০ সালের পরে ক্লোরিন-যুক্ত হাইড্রোকার্বন (যেমন, ডি.ডি.টি.) ব্যবহৃত হ'ত। এই ডি.ডি.টি.-ও যথেষ্ট ক্ষতিকারক, কারণ এর অর্ধস্থিতিকাল (half-life) খুব বেশি (৩০ বছর)। কৃষি-বিষের তৃতীয় পর্যায়ে এসেছিল জৈব ফসফেট-জাতীয় কীটনাশক, যেমন—ডাইমেথয়েট, ম্যালাথিয়ন ইত্যাদি। এগুলি আগের পর্যায়ের কীটনাশকগুলির তুলনায় কম ক্ষতিকারক। এদের অর্ধস্থিতিকাল ১৫-৯০ দিনের বেশি নয়। তবে এইসব কীটনাশকও ক্রমশ উদ্ভিদ থেকে তৃণভোজী প্রাণী ও পরে মানুষের মধ্যে বেশি বেশি মাত্রায় জমতে থাকে, যা একধরনের অতি ক্ষতিকর জৈব-বিবর্ধকের (bio-magnification) রূপ নেয়। আধুনিক কৃষিতে চতুর্থ পর্যায়ের কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পর্যায়ের কীট নিয়ন্ত্রক যৌগগুলির মধ্যে কীট-হরমোন (বা ফেরোমন), বৃদ্ধি সাহায্যকারী হরমোন, সাহায্যকারী জীবাণু (ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস) উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ পর্যায়ের কীট নিয়ন্ত্রক যৌগগুলির কার্যকারিতা যথেষ্ট আশাপ্রদ এবং প্রকৃতিতে এর বিরূপ প্রভাব সাময়িক ও সীমিত মাত্রার হয়। তবে এই পর্যায়ের কীট নিয়ন্ত্রক যৌগের ব্যবহার সাধারণ চাষিদের মধ্যে এখনও তেমন প্রচলিত নয়। বরং চাষিরা এখনও তৃতীয় পর্যায়ের কীটনাশকের উপর বেশি আস্থা রাখেন। প্রথম বা দ্বিতীয় পর্যায়ের কৃষি-বিষের প্রয়োগের মাত্রা হেক্টর প্রতি ২-৫ কিলোগ্রাম বা তার বেশি ছিল, পরবর্তী পর্যায়ের কৃষি-বিষের জন্য প্রয়োগমাত্রা ১০০-৫০০ গ্রাম এবং আরও পরের পর্যায়ের কৃষি-বিষের প্রয়োগমাত্রা ১০-৫০ গ্রাম প্রতি হেক্টরে। সারণি-১ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সময়ের সঙ্গে রাসায়নিক-নির্ভর নিবিড় চাষ পদ্ধতি বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট কৃষি-রাসায়নিকের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি, বরং অনেক ক্ষেত্রে পরিমাণ কমেছে। তবে প্রকৃত অবস্থাটা বোঝা যাবে, কৃষি-বিষের আমদানি মূল্য বিশ্লেষণ করলে (চিত্র-১ দ্রষ্টব্য)। এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ২০০০ সালের পর থেকে মাত্র ১৫ বছরের মধ্যেই কৃষি-বিষের আমদানি মূল্য ১৮ গুণেরও বেশি বেড়েছে।

চিত্র-১
ভারতে মোট আমদানিকৃত কৃষি-বিষের মূল্য
(হাজার মার্কিন ডলার)

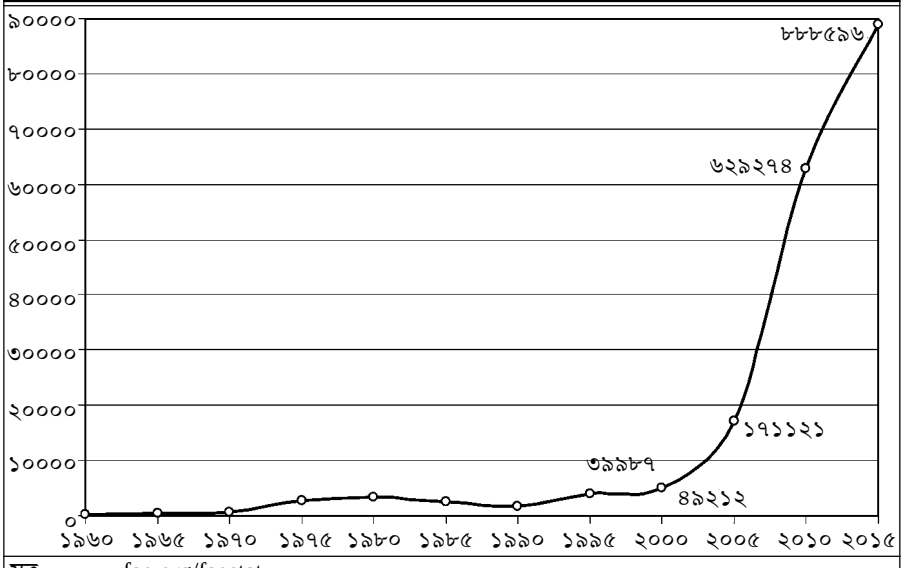

সূত্র : www.fao.org/faostat

কৃষি-বিষের দূষণের কার্যকারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, শুধুমাত্র এই রাসায়নিক পদার্থগুলির দূষণ ক্ষমতাই নয়, তার সঙ্গে ব্যবহারকারীর মানসিক ও সামাজিক কারণগুলিও জড়িত। এখানে একটু বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। ধরা যাক, কোনও একটি কৃষি-বিষের সুপারিশ মাত্রা, ১ মিলিলিটার/প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। কিন্তু চাষি তার জমির পরিমাণ এবং সুপারিশ অনুসারে যতটা প্রয়োগ করা উচিত, তার থেকে বেশি লাগবে মনে করে বাজার থেকে কিনে নিলেন। কৃষি-বিষ বিক্রেতাও লাভের কথা ভেবে চাষিকে বা ক্রেতাকে প্রভাবিত করেন বেশি পরিমাণে কৃষি-বিষ প্রয়োগের জন্য। তা ছাড়া কৃষি-বিষ বিক্রয়কারী ডিলারদের উপর যৌগ উৎপাদনকারী ও বিপণনকারী সংস্থার বিভিন্ন প্রলোভনমূলক প্ররোচনা থাকে। তাতে ওই ডিলার অল্প সময়ে বেশি পরিমাণে কৃষি-বিষ বিক্রির ধান্দায় থাকেন। ফলত, চাষিরা তাদের জমিতে সুপারিশ মাত্রার থেকে বহুগুণ বেশি হারে এই বিষ প্রয়োগ করে চলেছেন। যেখানে ১ মিলিলিটার হারে প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল, বাস্তবে তা ৪-৫ গুণ বেশি হারে হচ্ছে। ইদানীংকালে এই কৃষি-রাসায়নিকের দাম চাষিদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যেই থাকে। ফসল উৎপাদনের মোট ব্যয়ের মাত্র ৩-৫ শতাংশ কৃষি-বিষের জন্য খরচ হয়। তা ছাড়া ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের, এমনকি অনেক বড়ো চাষিদেরও কৃষি-বিষের দূষণ বা ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট ধারণা নেই। বছরের পর বছর সুপারিশ মাত্রার থেকে বহুগুণ বেশি হারে কৃষি-বিষ প্রয়োগের ফলে, রোগ-পোকার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে প্রযুক্ত কৃষি-বিষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে এবং দিন দিন যথেচ্ছ বেশি পরিমাণে কৃষি-বিষ প্রয়োগ করেও তা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

কৃষি-বিষের ব্যবহারগত ও পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য যে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, তাতে সন্দেহের অবকাশই নেই। অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যবহৃত কৃষি-বিষ চাষের জমি থেকে ক্রমশ মনুষ্যবসতির চারপাশের পুকুর, ডোবা, মাটি, স্কুল-কলেজের খোলা মাঠ, পার্ক, বেড়ানোর

জায়গা এসবই দূষিত করছে। কখনও কখনও দুর্ঘটনাজনিত কারণেও কৃষি-বিষ ব্যাপক দূষণের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ ১৯৮৪ সালের ২ ডিসেম্বরের ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা। ভোপালের একটি কীটনাশক উৎপাদনকারী সংস্থার কারখানায় দুর্ঘটনাক্রমে এক রাত্রে ৪০ টন মিথাইল আইসোসায়ানেট, যা অতিমাত্রা বিষাক্ত গ্যাস, বাতাসে মিশে ভোপাল শহরের বেশ কয়েক হাজার মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়। যারা প্রাণে বেঁচে যান, তাদের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায় ও দেহে নানারকম বিরূপ প্রভাব পড়ে।

শুধুমাত্র রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য নয়, এমনকি ফল, সবজি বাজারজাত করার সময় যাতে বেশিদিন টাটকা থাকে, পচন না ধরে বা তাজা দেখায় তার জন্যও বিভিন্ন ধরনের অনুমতিহীন ক্ষতিকর রাসায়নিক যৌগের বেআইনি ব্যবহার হচ্ছে। যেমন, নীল রংয়ের জন্য তুঁতে (কপার সালফেট), গোলাপি বা লাল রংয়ের জন্য রোডামাইন অক্সাইড, সবুজের জন্য ম্যালাসাইট গ্রিন যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। বেগুন জাতীয় সবজির বাইরেটা চকচকে করার জন্য পেট্রোলিয়াম-জাতীয় তেল ব্যবহৃত হচ্ছে। বেশ কিছুদিন ধরে শোনা যাচ্ছে যে তরমুজের ভিতরের শাঁস লাল করার জন্য ক্ষতিকর লাল রংয়ের যৌগ (রোডামাইন) ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি-বিষ ছাড়াও রাসায়নিক সারের মাধ্যমেও দূষণ ছড়ায়। একই জমি থেকে বেশি উৎপাদনের লক্ষ্যে ইউরিয়া সারের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য)।

নাইট্রোজেন ঘটিত সার, যেমন—ইউরিয়া মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে কিছুটা মাটির নিচে চলে গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলকে দূষিত করে এবং জমির প্রবাহমান জল বা বৃষ্টির জলের সঙ্গে বাহিত হয়ে পুকুর বা অন্য জলাশয়ে দূষণের কারণ হয়। এছাড়াও অতিরিক্ত মাত্রায় ফসফেট সারও দূষণের জন্য দায়ি হতে পারে। চাষ পদ্ধতির কিছু ত্রুটির কারণেও দূষণ ঘটে। যেমন, বোরো ধান চাষে প্রচুর পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল তোলা হয় এবং এই একটি কারণেই পশ্চিমবঙ্গের ১১১-টি ব্লকে আর্সেনিকের সমস্যা রীতিমতো ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নদীয়া জেলার হরিণঘাটা ও চাকদা ব্লকের পানীয় জলে প্রচুর পরিমাণে (০.৮৯ মিলিগ্রাম/প্রতি লিটারে) এবং উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা ব্লকে খুব বেশি (০.৫০ মিলিগ্রাম/প্রতি লিটারে) পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। কলকাতা শহরের পূর্বদিকের সীমানা বরাবর অঞ্চল, যাকে 'ধাপা' নামে ডাকা হয়, সেখানকার মাটিতে দূষণ সৃষ্টিকারী ক্যাডমিয়াম, নিকেল, সিসা, ক্রোমিয়াম ইত্যাদি বিভিন্ন মাত্রায় মিশে আছে। সরকারি নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করেই ধাপা অঞ্চলে সংগঠিত (এবং অসংগঠিত)-ভাবে প্রচুর সবজি উৎপাদন করা হয়। এই অঞ্চলের উৎপাদিত সবজিতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিকর ভারী ধাতু মিশে থাকে, যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতিকর।

সারণি-১
ভারতে প্রধান প্রধান কৃষি রাসায়নিকের ব্যবহার

(হাজার টন)

সাল	কীটনাশক	ছত্রাকনাশক ও ব্যাক্টিরিয়ানাশক	আগাছানাশক	ইঁদুরের বিষ	মোট কৃষি-রাসায়নিক
১৯৯০	৫৭.৯৪	১০.৯০	৫.৮২	০.৩০৪	৭৫.০০
১৯৯৫	৪০.০৪	৯.৬৩	৬.১২	০.২৩৬	৬১.২৬
২০০০	২৭.৪০	৭.৮০	৭.৪৮	০.৫৬৩	৪৬.১৯
২০০৫	২১.৭৮	৬.৫৬	৬.৯৬	০.৩৪৩	৩৫.৩৪
২০১০	২০.৬২	১৩.০৫	৬.৩৩	—	৪০.০৯
২০১৫	—	—	—	—	৫৬.১২

সূত্র : www.fao.org/faostat

ধাপা অঞ্চলে উৎপন্ন সবজিতে ভালোভাবে জলে ধোয়ার পরেও প্রচুর পরিমাণে ভারী ধাতু থেকে যায়। ক্যাডমিয়াম সহনশীল মাত্রার থেকে লাউশাকে ৫.৬, লালশাকে ৪.৭, পুঁইশাকে ১.৮ এবং বেগুনে ২.৫ গুণ বেশি মাত্রায় পাওয়া গেছে। আরও একটি ভারী ধাতু, সিসাও ধাপার সবজিতে খুব বেশি পরিমাণে দূষণ ঘটিয়ে থাকে। এখানকার লালশাকে ৫৭.৯, লাউশাকে ২১.৬, পুঁইশাকে ১৬.৬ এবং বেগুনে ১৪.০ মাইক্রোগ্রাম/প্রতি গ্রাম সিসা পাওয়া গেছে। এই মাত্রা সহনশীল মাত্রার থেকে ১৩-১৯৩ গুণ বেশি, যা খুবই ভীতির কারণ (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

চিত্র-২
ভারতে ইউরিয়া সারের ব্যবহার

(লক্ষ টন)

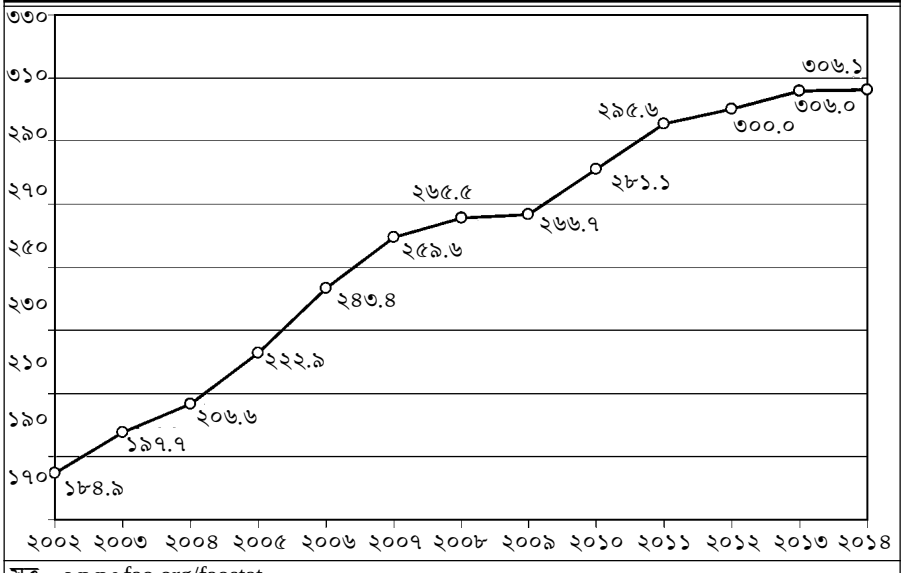

সূত্র : www.fao.org/faostat

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফসলের অবশেষ অংশের পরিমাণও বহুগুণ বেড়েছে। গত কয়েক দশক ধরে ফসল উৎপাদনে উন্নত কৃষি-প্রযুক্তির গবেষণা খাতে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং তার আশানুরূপ ফলও পাওয়া গেছে। কিন্তু বিপুল পরিমাণ ফসলের অবশেষ অংশের সুষ্ঠু ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা অপ্রতুল। যতটুকু সাফল্য পাওয়া গেছে, তাও হয় চাষিদের কাছে এখনও পৌঁছায়নি বা গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাছাড়া একই জমি থেকে বছরে তিন বা তার বেশি বার ফসল ফলানোর ফলে, জমিতে ফসলের অবশেষের পচন প্রক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। তাই, বিশেষত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের চাষিরা ব্যাপকভাবে ফসলের অবশেষ পোড়ান। এর ফলে মাটিতে জীবাণুর ভারসাম্য নষ্ট হয়, সেই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ধূলিকণা বাতাসে মিশে দূষণের কারণ হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৫ সালে ৪৮২ লক্ষ টন ফসলের অবশেষ পোড়ানো হয়েছে (চিত্র-৩ দ্রষ্টব্য) এবং তার দরুন ৩৭.৮ লক্ষ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে নির্গত হয়েছে (চিত্র-৪ দ্রষ্টব্য)। এই বিপুল পরিমাণ দূষণ সৃষ্টিকারী গ্যাস ও ধূলিকণা ওই অঞ্চলের এবং পাশাপাশি অনেকটা জায়গার নাগরিকদের সুস্থ জীবনযাপনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। বিগত বছরগুলির মতো চলতি বছরেও (২০১৭) কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ জানিয়েছে যে, দিল্লি এবং তার আশপাশের বাতাসের গুণগত মান (Air Quality Index) শস্য অবশেষ পোড়ানোর সময় (নভেম্বর থেকে জানুয়ারি) খারাপ (২০১-৩০০) থেকে অতি খারাপ (৩০১-৪০০) হয়েছে।

সারণি-২
সবজিতে ভারী ধাতুর পরিমাণ
(মাইক্রো গ্রাম প্রতি গ্রাম শুকনো ওজন হিসাবে)

সবজি	ক্যাডমিয়াম	সিসা	তামা	ক্রোমিয়াম
বেগুন	০.৫১	১৪.০০	১১.৭৫	১.২১
পুঁইশাক	০.৩৭	১৬.৫৭	১৬.১৩	১.১৩
লালশাক	০.৯৪	৫৭.৯২	১৭.১৪	০.৬৯
ফুলকপি	০.১১	৩.৯৩	৬.১১	২.৪৫
বাঁধাকপি	০.০৭	৫.১৪	০.৪৫	০.২১
লাউশাক	১.১২	২১.৬১	১০.৮৫	৩.৩৮
সহনশীল মাত্রা	০.২০	০.৩০	৪০.০০	২.৩০

সূত্র : Bairagi *et al.*, 2010

সমাধান

কৃষি-বিষের সমস্যা যে ইতোমধ্যেই ব্যাপক আকার নিয়েছে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে নিতে হবে এবং কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে, তবেই এই দূষণের হাত থেকে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে বাঁচানো সম্ভব। যেহেতু চাষিদের অনুসৃত আধুনিক কৃষিব্যবস্থা এই কৃষি-বিষের দূষণের জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেও দায়ি, তাই এই কৃষিব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। এখানে বলে রাখা ভালো, বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টায় কৃষিবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ ও নব নব প্রযুক্তির উদ্ভাবনের সুফল অনেক সময়ই কৃষকরা কাঙ্ক্ষিত দ্রুততার সঙ্গে গ্রহণ করেন না। তার জন্য কৃষকদের আর্থ-সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি, সরকারি বা অ-সরকারি স্তরে কৃষি সম্প্রসারণ পদ্ধতির দুর্বলতা ও প্রায়শই সম্প্রসারণ কর্মী সংখ্যার অপ্রতুলতাই মূলত দায়ি। কৃষকরা খানিকটা পুরোনো ধ্যান-ধারণার উপর নির্ভর করেই চাষ করেন। একথা জোরের সঙ্গে বলা যায়, চাষিরা যদি কেবলমাত্র সুপারিশমতো আধুনিক কৃষি পদ্ধতি মেনে ফসল উৎপাদন করেন, তবে ফলন যেমন ভালো হবে, সেই সঙ্গে সীমিত মাত্রায় কৃষি-বিষের প্রয়োগে দূষণও বিপদসীমা অতিক্রম করবে না। আধুনিক কৃষিতে যে সুসংহত রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার (Integrated Pest Management বা IMP) কথা বলা হয়, তার স্পষ্ট ধারণা ও সঠিক ব্যবহার জরুরি। এই সুসংহত পদ্ধতিতে, কৃষি-বিষের ব্যবহারের আগে, চাষ পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ধারণা মান্য করা হয়। এই ধারণায়, ফসলের কীটশত্রু ও রোগ সহনশীল জাত নির্বাচন, বীজ লাগানোর সঠিক সময় নিরূপণ, সারি করে শস্য লাগানোর পদ্ধতি (যাতে ফসলের

চিত্র-৩
ভারতে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর পরিমাণ
(লক্ষ টন)

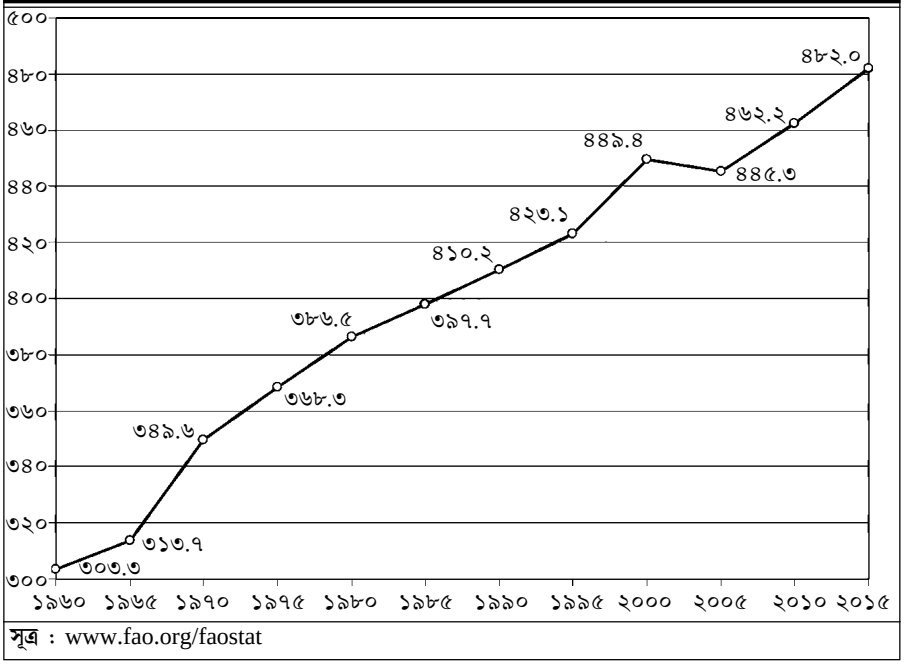

সূত্র : www.fao.org/faostat

পল্লবাচ্ছাদনের ভিতরে যথেষ্ট আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে ও রোগ-পোকা অর্থনৈতিক ক্ষতির সীমার মধ্যে থাকে), মাটি পরীক্ষা করে ও নির্দিষ্ট ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সারের মাত্রা নির্বাচন, সময়মতো আগাছা নিয়ন্ত্রণ, নিড়ানি দেওয়া ও মাটি আলগা করা, নিয়মিত জমি পরিদর্শন ইত্যাদির বিশেষ গুরুত্ব আছে। জমি পরিদর্শনের উপকারিতার এক উদাহরণ হল, পরিদর্শনের মাধ্যমে পাটের বিছা পোকা (Bihar Hairy Caterpillar) নিয়ন্ত্রণ। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী বিছা পোকা পাটের জমিতে আলের ধারের গাছের পাতাতেই একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে এবং ওই পোকার শুককীটগুলি (লার্ভা) প্রথম অবস্থায় মাত্র গুটিকয়েক পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। চাষিরা যদি ওই লার্ভা-সহ কয়েকটি পাতা গাছ থেকে তুলে নষ্ট করে দেন, তাহলে সহজেই পাটের বিছা পোকা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কোনও কৃষি-বিষের প্রয়োজন হয় না। অনেক আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণে আলোর ফাঁদ (Light Trap) ব্যবহারের কথা বলছেন। এর মাধ্যমে কৃষি-বিষের ব্যবহার অনেকটাই কমানো যায়। কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণের নতুন পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতির মধ্যে ফেরোমন ফাঁদ (Pheromone Trap) বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই পদ্ধতিতে বিশেষ প্রজাতির পোকার জন্য নির্দিষ্ট ফেরোমন হরমোন অতি অল্পমাত্রায় ফাঁদে ব্যবহৃত হয়। ফলে সেই নির্দিষ্ট প্রজাতির পুরুষ পোকা আকৃষ্ট হয় ও বিনষ্ট হয়, এবং স্ত্রী পোকা থেকে পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি হতে পারে না। এই পদ্ধতি অনেক কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণে (বিশেষত সবজি ও ফল চাষে) খুবই ফলপ্রসূ এবং পরিবেশে কৃষি-বিষের ভার চাপায় না। যেকোনও ফসলের বীজ বোনার বা লাগানোর আগে অবশ্যই বীজ শোধন করতে হবে। এতে খুবই সামান্য পরিমাণে রাসায়নিক ব্যবহার করে অনেক রোগের আক্রমণ থেকে ফসলকে, অতিরিক্ত কৃষি-বিষ ব্যবহার না করেই বাঁচানো যায়। তা ছাড়া জমিতে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু সারের ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। জীবাণু সার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণের কাজও করে। জমিতে কোনও রোগ-পোকার আক্রমণ হবার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক কৃষি-বিষ প্রয়োগ করা উচিত নয়। প্রথমেই জমি পরিদর্শনে গিয়ে আক্রমণের মাত্রা বা প্রতি একক পরিমাণ জমিতে ওই নির্দিষ্ট রোগ বা পোকার সংখ্যা ক্ষতিকর সীমা অতিক্রম করেছে কি না তা দেখতে হবে। যদি তা ক্ষতিকর সীমা লঙ্ঘন করে, তবেই সেই রোগ বা পোকা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই রাসায়নিক কৃষি-বিষের পরিবর্তে নিম তেল ব্যবহার করে সুফল পাওয়া যায়। নিম তেল এখন সহজেই বাজারে মেলে অথবা চাষিরা নিজেরাও নিম ফল থেকে কীটনাশক তৈরি করে নিতে পারেন। জৈব কীটনাশকের মাত্রা বাড়িয়েও যদি কীটশত্রু নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে সুপারিশ অনুসারে রাসায়নিক কৃষি-বিষ ব্যবহার করা উচিত। কৃষি-বিষ যদি নির্দিষ্ট মাত্রায় এবং সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হয়, তবে তা পরিবেশকে খুব বেশি দূষিত করে না। এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, জমিতে শত্রু পোকার পাশাপাশি অনেক প্রজাতির বন্ধু পোকাও থাকে, ফলে প্রায়শই শত্রু পোকার সংখ্যা ক্ষতিকর সীমা পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে না। অকারণে কম সংখ্যার শত্রু পোকা মারার জন্য কৃষি-বিষ প্রয়োগ করলে, উপকারী পোকাগুলিও মরে যায় এবং জমিতে পোকার স্বাভাবিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। এর পরে যে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে তা হল, সুসংহত উদ্ভিদ খাদ্য জোগান ব্যবস্থা (Integrated Nutrient Management বা INM)। জমিতে কেবলমাত্র রাসায়নিক সার প্রয়োগ করলে, জমির উর্বরতা শক্তি বেশি দিন স্থায়ী হয় না। তাই সুষম রাসায়নিক সারের সঙ্গে সুপারিশ মতো জৈবসারও জোগান দিতে হবে। গোবর সার, কেঁচো সার, সবুজ সার, খইল, জীবাণু সার ইত্যাদি জৈব সার হিসাবে সুপারিশ করা হয়।

সারণি-৩
ফসলের বৃদ্ধিকারী জীবাণুর (PGPR) গুরুত্ব ও উপযোগিতা

ফসলের বৃদ্ধিকারী জীবাণু (PGPR)	গুরুত্ব ও উপযোগিতা
অ্যাজোটোব্যাক্টর, অ্যাজোস্পাইরিলাম, সিউডোমোনাস, ব্যাসিলাস, অ্যাগ্রোব্যাক্টিরিয়াম, আর্থ্রোব্যাক্টর, এন্টেরোব্যাক্টর,	■ অল্প মাত্রায় কার্যকরী। ■ ফসলের জন্য নাইট্রোজেন জোগান (২০-৪০ কেজি) দিতে পারে। ■ বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ও শিকড়ের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ■ অ্যাজোটোব্যাক্টরের ফসলের রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাকনাশক গুণ আছে। ■ ব্যাসিলাস ও সিউডোমোনাস, মাটির অদ্রবণীয় ফসফরাসকে দ্রবণীয় করে গ্রহণ গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। ■ সিউডোমোনাস, আয়রন অভাবযুক্ত মাটি থেকেও প্রয়োজনীয় আয়রন গ্রহণ করতে সাহায্য করে। ■ জীবাণুনাশক ঔষধ ও উৎসেচক তৈরির মাধ্যমে ফসলের রোগ নিয়ন্ত্রণ করে। ■ ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি দিয়ে বীজ শোধন করলে মাটি বাহিত ছত্রাক-জাতীয় রোগ থেকে রেহাই।

নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু, যেমন,—অ্যাজোটোব্যাকটার, রাইজোবিয়াম, অ্যাজোস্পাইরিলাম, ইত্যাদি এবং ফসফেট দ্রবণক্ষম জীবাণু বা ফসফোব্যাকটার ব্যবহারে জমির উর্বরতাশক্তি দীর্ঘ সময়ের জন্য উচ্চ ফলনক্ষম থাকে। এই জীবাণু সারের প্রয়োগের ফলে, জমিতে নাইট্রোজেনঘটিত রাসায়নিক সারের মাত্রা অনেক কম হলেও ভালো ফলন পাওয়া যাবে (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)। ফলে রাসায়নিক সারের সীমিত ব্যবহার পরিবেশকে দূষিত করবে না। এই আলোচনার আগের অংশে আর্সেনিক দূষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব কম করতে নিয়মিত জৈব সার, পোল্ট্রি সার, নিম খইল ইত্যাদি জমিতে ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও নীল-সবুজ শৈবাল (Blue-green algae), অ্যানাবেনা, নস্টক এবং আরও কিছু উপকারী জীবাণু জমিতে আর্সেনিকের দূষণ কম করতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, অদূরদর্শী ও অসংযতভাবে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের ফলে আর্সেনিক দূষণ এত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তাই কৃষিতে দূষণ কমাতে কার্যকর ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। ভূগর্ভস্থ জলের উপর নির্ভরশীলতা কম করতে বৃষ্টির জলের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার (Rain water harvesting) বাড়াতে হবে। তাছাড়া অনেক ফসলেই প্লাবন সেচের (Flood irrigation) পরিবর্তে ঝারি/ফোয়ারা সেচ (Sprinkler irrigation) ও ফোঁটা

সেচ (Drip irrigation) দিলে অসুবিধা নেই। ফলে জলের অপচয় কম হবে এবং জলের লিটার প্রতি অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। রোয়া ধানের ক্ষেত্রে এখনও চাষিরা জল দাঁড় করিয়ে রাখেন, এই পদ্ধতির আর প্রয়োজন হয় না। পরীক্ষায় প্রমাণিত, ধানের খেতে নির্দিষ্ট মাত্রার ভেজা ভাব বা জল দ্বারা মাটির সংপৃক্ততা (Soil saturation) থাকলেই তা ধানের উচ্চ ফলনের জন্য অনুকূল, দাঁড়ানো জলের প্রয়োজন হয় না। ইতোমধ্যেই চাষিরা শ্রী-পদ্ধতিতে (SRI) অল্প জল ব্যবহার করেই ধানের ভালো ফলন পাচ্ছেন, এটা আশার কথা। যে অঞ্চলে জলের অপ্রতুলতা আছে বা ভূগর্ভস্থ জল থাকলেও তা আর্সেনিক বা ওই ধরনের কোনও দূষণের শিকার, সেক্ষেত্রে ধানের পরিবর্তে চাষের জন্য অন্য ফসল নির্বাচন করতে হবে, যাদের জলের চাহিদা কম। বিশেষত, ডালশস্য এবং বেশ কিছু তৈলবীজে সেচের প্রয়োজনীয়তা অনেক কম। ধান চাষে প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ ১২০০ মিলিলিটার, কিন্তু ছোলা চাষে মাত্র ২৫০ মিলিলিটার জল লাগে। অর্থাৎ, এক হেক্টর ধান চাষের সম পরিমাণ জল দিয়ে ৪.৮ হেক্টর ছোলা চাষ করা যাবে। তাই শস্য পর্যায়ে এই ধরনের কম জলের ফসলের অন্তর্ভুক্তির কথা ভাবতে হবে।

উচ্চ উৎপাদনমুখী কৃষিতে যে বিপুল পরিমাণ ফসলের অবশেষ তৈরি হয়, তার দ্রুত ও সুষ্ঠু ব্যবহার জরুরি। অন্যথায় চাষিরা এগুলি পোড়ানোর ফলে বায়ুদূষণ চলতে থাকবে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানে ফসলের অবশেষ পোড়ানোর প্রচলন বেশি। বেশ কিছু দিন আগে থেকেই ফসলের অবশেষ ব্যবহারের বিষয়ে গবেষণা চলছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সাফল্যও পাওয়া গেছে। ধানের খড়কে এক ধরনের জীবাণুর (Enterobacter) দ্বারা জৈব-হাইড্রোজেন তৈরিতে চিন সাফল্য পেয়েছে। ধান ও গমের খড় সহজে পচে না, ফলে জৈব সার তৈরিতে দেরি হয়, কিন্তু শিম্ব গোত্রীয় (ডাল শস্য) ফসলের অবশেষ থেকে সহজেই জৈব সার তৈরি হতে পারে। প্রথাগত কর্ষণের মাধ্যমে চাষ ছাড়াও, সংরক্ষিত চাষ (conservation tillage) বা শূন্য কর্ষণ (Zero tillage) চাষের মাধ্যমেও বেশকিছু

চিত্র-৪
ভারতে ফসলের অবশেষ পোড়ানোর জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন
(গিগা গ্রাম)

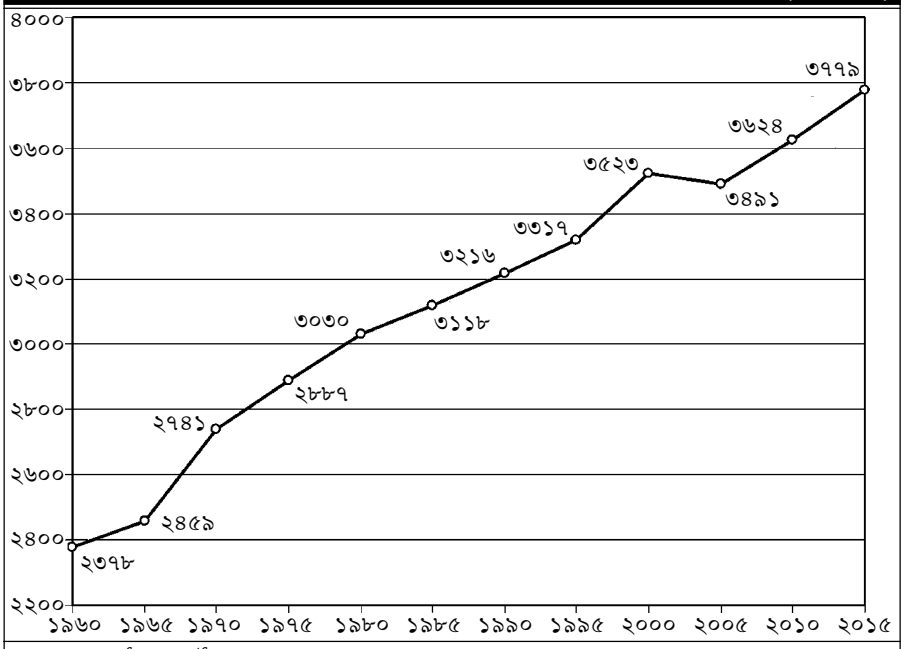

সূত্র : www.fao.org/faostat

ফসল ফলানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে জমিতে থাকা আগের ফসলের অবশেষ সরিয়ে ফেলতে হয় না এবং এই অবস্থাতেই পরের ফসল লাগানো যায়। ফসলের অবশেষ অনেকভাবে অন্য ফসলের জমির মাটির আচ্ছাদন (Mulching) হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। ফসলের অবশেষ ঠিকভাবে ব্যবহৃত হবার জন্য, শূন্যকর্ষণ বীজ বপন যন্ত্র (Zero till seed drill), অবশেষ কাটার যন্ত্র (Straw chopper) অবশেষ বাঁধার যন্ত্র (Straw bailer) সম্পর্কে চাষিদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এই যন্ত্রগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তার প্রশিক্ষণের জন্য সরকার হেক্টর প্রতি ৪,০০০ টাকা অর্থ সাহায্য দিচ্ছে। বর্তমান অর্থ বছরে (২০১৭-'১৮) ফসলের অবশেষ যাতে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়, তার জন্য পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের জন্য যথাক্রমে ৪৮.৫, ৪৫, ৩০ এবং ৯ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে (সূত্র : প্রেস ইনফরমেশান ব্যুরো, ভারত সরকার; ১০ নভেম্বর, ২০১৭)।

আরও কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে হবে। যতটা সম্ভব জৈব চাষকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যে জাতীয় স্তরে এর ফলে যেন মোট উৎপাদনে ঘাটতি না হয়। বিভিন্ন সম্প্রসারণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং গণমাধ্যমের দ্বারা কৃষি-বিষের সম্পর্কে চাষিদের, এমনকি সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, কোনও ফসলের মোট উৎপাদন কোনও বিশেষ বছরে অনেক বেশি হওয়ার ফলে, ফসলের অপচয় হয়; এই অতিরিক্ত ফলন ফলাতে গিয়েও কৃষি-বিষ প্রযুক্ত হয় ও পরিবেশের ক্ষতি বাড়িয়ে দেয়। তাই ফসলের উৎপাদনে জাতীয় স্তরে পরিকল্পনার মাধ্যমে স্থিতিশীলতা আনতে হবে। উৎপাদিত ফলনকে সরকারি স্তরে এবং বেসরকারি স্তরে সুনির্দিষ্ট সংরক্ষণ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে। উৎপাদিত ফসলের দ্রুত ও কার্যকর বণ্টন ব্যবস্থা থাকতে হবে, যা অনেক সময়ই বেশি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে এবং পরোক্ষভাবে কৃষি-বিষের দূষণ কমাতে সাহায্য করে। সর্বোপরি সরকারি জাতীয় নীতি নির্ধারক স্তরে প্রকৃত সদিচ্ছা এবং কৃষক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দূষণ ও পরিবেশ সচেতনতা অবশ্যই কৃষি-বিষের দূষণ ন্যূনতম করতে সক্ষম হবে।❑